

ভারতে জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-১৯৭৭)

২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭ পর্যন্ত ২১ মাসব্যাপী **ভারতের জরুরি অবস্থা** ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। এই জরুরি অবস্থার পরামর্শদাতা ছিলেন ভারতের তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় সংবিধানে ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী এই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) ও ‘সেন্সর’ রবীন্দ্রনাথ

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,

কে বাঁচিতে চায়।

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,

কে পরিবে পায়।”

পরাদীন ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বজনবিদিত এই সংগীতটি ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-১৯৭৭) ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ, এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল। তাই বলা হয়, ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা এক কলঙ্কিত অধ্যায়। আর দীর্ঘ একুশ মাস ধরে চলতে থাকা এই জরুরি অবস্থার সূচনা হয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ২৬-এ জুন সকালবেলায়। তবে এর প্রস্তুতি চলেছিল অনেক আগে থেকেই। দেখা গিয়েছিল যে, দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ১৯৭৫-এর ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছিল। মূলত এই রায়ে রাজনারায়ণের আনা মামলায় ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ৬ বৎসর পার্লামেন্টারি রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।^১ শুধু তাই নয়, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিংহ রায়বেরিলি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন। যাইহোক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর দিনই গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছিল এবং তাতে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল।^২

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর ১৩ দিন পর অর্থাৎ ২৫-শে জুন বিরোধী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাঁরা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে এক সপ্তাহব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাবে এবং ঐ দাবি জানাতে তাঁরা একদিন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতেও যাবে। কিন্তু বিরোধী দলগুলি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বেছে নিয়েছিলেন মানুষের অধিকার হরণের রাস্তাটিকে। আসলে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তিনি এতটাই আতঙ্ক হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই কারণে দলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি যে স্বৈরতান্ত্রিক আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করে আসছিলেন, সেটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। এমন অবস্থায় ক্ষমতাই থাকার ভবিষ্যৎ তাঁর যতই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ততই তিনি ক্ষমতাই থাকতে চাইছিলেন। অর্থাৎ, সমস্যা সমাধানের কোনো কল্যাণকামী নীতি গ্রহণ তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না, তাঁর বা তাঁর দলের শ্রেণিস্বার্থেই। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই রাস্তাটিকে। ইতিমধ্যে ২৫-এ জুন জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লিতে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী ভারতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন এবং জনসাধারণকে এজন্য সতর্ক হতে বলেন (‘দি টাইমস-লন্ডন, ২৭ জুন, ১৯৭৫’)। সেই ২৫ জুন রাতেই শুরু হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সি. পি. আই বাদে অন্য বিরোধী দলগুলির নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার। ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ নং ধারার, ১ উপধারা অনুসারে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন- ‘a grave emergency exists whereby the security of India is threatend by internal disturbances.’^৩ এর ফলে ভারতের রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্র একটা পাকাপাকি ভিত্তি পেয়ে গিয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর অভাবনীয় আক্রমণ নেমে এসেছিল। তাই দেখা গিয়েছিল যে, ২৬ জুন সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সরকারি আদেশগুলিকে বিচারবিভাগের আওতার বাইরে রেখে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে সেভাবে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, বিনা বিচারে যেকোনো ব্যক্তিকে জেলে পুরে রাখার জন্য নতুন করে মিসা অর্ডিন্যান্স হিসাবে চালু হয়েছিল যা তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনবার সংশোধিত হয়েছিল। এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংগঠন ও জমায়েতের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, বিক্ষোভ-প্রতিবাদের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অনেক রাজ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক, কর্মচারী, খেতমজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে দূরে রাখা হয়েছিল মিসা, ডি. আই. আর ইত্যাদি আইনে গ্রেপ্তার ও জেলে পুলিশি অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে। বলাবাহুল্য, এক বিরাট পুলিশ-রাজ আশ্বপ্রকাশ করেছিল সেইসময়।

পাশাপাশি শুরু হয়েছিল শিল্প-সংস্কৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও অত্যাচার। তাই ১৯৭৫ সালে বহু নাট্যকর্মীর ওপর নৃশংস অত্যাচার নেমে এসেছিল। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে নাট্যকার অমল রায়ের ওপর একদল সশস্ত্র গুন্ডা আক্রমণ করেছিল এবং ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে শ্রী সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাশি চালিয়েছিল। ১৯৭৬ সালে বারাকপুরে নটতীর্থ ‘নিজবাসভূমে’ নাটকটি মঞ্চস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত শিল্পীরা তার আগেই সরে গিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে নৈহাটিতে মুকুন্দদাস যাত্রাসমাজ শরৎচন্দ্রের ‘অভাগী স্বর্গ’ গল্পের পালারূপ অভিনয় করতে গেলে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এছাড়া তারকেশ্বরে ‘হে রাজবিদ্রোহী’, হাওড়ার শিবপুরে ‘দিন আসবেই’, বসিরহাটে ‘লাসবিপণি’, শ্রীরামপুরে ‘রক্তের জোয়ারে শুনি’ প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চস্থ হলে এগুলির ওপরও আক্রমণ চালানো হয়েছিল।৪

জরুরি অবস্থায় চলচ্চিত্র জগতও প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওমপ্রকাশের আঁধি, চেতন আনন্দের অফিসার ও সাহেব বাহাদুর, বি. এস. নাগির গোল্ডমেডেল রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি হয়েছিল। মনোমোহন দেশাইয়ের ধরমবীর ও আর সিঙ্গির শোলের রিলিজে বাধা এসেছিল। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গুলজারের মৌসম-এর বহু দৃশ্য অযৌক্তিকভাবে কাটা হয়েছিল। বহু সংলাপ সেন্সর হয়েছিল। অমরজিৎ পিকচার্সের ছবির নাম ছিল ‘ইন্দিরা’। গল্পের নায়িকার নামে ছবি। কোনো রাজনীতি ছিল না তবুও বাতিল করা হয়েছিল। তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল অমৃত নাহাতা প্রযোজিত ‘কিসসা কুরসিকা’। ঐ ছবিটির সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে দেওয়া হয়েছিল। ২৬ এপ্রিল সেন্সর বোর্ডের পরীক্ষক কমিটি ফিল্মটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন এবং সার্টিফিকেট দানে মতবিরোধ ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত ফিল্মটি আটক করা হয়েছিল এবং সঞ্জয় গান্ধির নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলে প্রমাণ লোপাট করা হয়েছিল। ফলে নানাভাবে চলচ্চিত্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি দূরদর্শনে চলতি ছবিগুলি দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নায়ক নায়িকাদের টি. ভিতে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেন্সরনীতি চালু করে প্রডিউসারদের শত্রু হয়ে শ্রী শুক্লা প্রথম শ্রেণীর নায়ক নায়িকা, পরিচালকদের গোলাম করে রাখতে চেয়েছিলেন। অঘোষিত আইন জারি হয়েছিল যেকোনো শিল্পীকে মেক আপ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু শিল্পীকে সই করতে হয়েছিল চুক্তিপত্রে। যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের ছবি আর মুক্তি পাইনি।৫

শুধুমাত্র সংবাদপত্র, নাটক এবং চলচ্চিত্র ওপরেই সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেই ক্ষান্ত হননি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গান, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প- এগুলিও সেন্সর করা হয়েছিল। মূলত, শঙ্খ ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গাঙ্গুলী, দীপক মজুমদার, মণিশ ঘটক, কমলেশ সেন, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল মল্লিক, অঞ্জন কর, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দীপক মজুমদার, সুনীল গাঙ্গুলি, গৌরকিশোর ঘোষ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বিদ্যুৎবরণ চক্রবর্তী, শম্ভু রক্ষিত প্রমুখের কবিতা, সমর সেনের গদ্য, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস, উদয় রায়ের গল্প প্রভৃতির পাশাপাশি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতার প্রচারেও সেন্সর আরোপ করা হয়েছিল। এমনকি, চলচ্চিত্রের এককালের বিশিষ্ট অভিনেতা ও জনপ্রিয় গায়ক কিশোর কুমারের হিন্দি ছবিতে কাজ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যুব কংগ্রেসের আয়োজিত দিল্লির সংগীত সন্ধ্যায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি বলে তাঁর রেডিও প্রোগ্রামও বাতিল করা হয়েছিল।৬ এইভাবে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল।

আমরা দেখতে পেলাম যে, জরুরি অবস্থা কিভাবে ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করেছিল। তবে এই সব কিছুকে ছাপিয়ে যে বিষয়টি আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে যায় সেটি হল আমাদের চিরপরিচিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেন্সরের বাইরে যাননি। তাঁর লেখা কবিতা এবং অসংখ্য গান সেন্সর করা হয়েছিল। আর তাঁর সূচনা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৭-এ জুন ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’ কবিতাটির ইংরাজি অনুবাদ (‘Where the mind is Without fear’) সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপানোর পর থেকে।৭ স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, ১৯০১ সালে প্রকাশিত ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটির মধ্যে এমন কি ছিল যার জন্য দীর্ঘ ৭৪ বছর পরে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হল? উত্তরটা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা, তবুও আরও একবার যদি আমরা কবিতাটির মূল বক্তব্যের দিকেই তাকায় তাহলে দেখব যে, কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কবি আসলে পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতার স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। সেই জগতে চিত্ত হবে ভয়শূন্য এবং মর্যাদায় পরিপূর্ণ। সংকীর্ণ ও গোঁড়া মনোভাবের দ্বারা সীমিত না হয়ে দেশবাসী সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জন ও পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করবে এবং বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করবে। সাম্প্রদায়িক ও জাতিগতভাবে বিভাজিত না হয়ে দেশের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেই জগতে শুধু সত্য কথাই বলা হবে। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন এবং বিস্তৃত চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের দিকে লোকেরা অগ্রসর হবে এবং অল্পান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনে সচেষ্ট হবে। আর সেটাই তাঁদের প্রকৃত স্বাধীনতা দেবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর দেশকে কেবলমাত্র একটি স্বাধীন দেশ হিসেবেই দেখতে চাননি, তাঁকে একটি মহান দেশ হিসেবেও দেখতে চেয়েছিলেন। সেকারণে এই কবিতাটিতে তিনি এমন একটি দেশের কাল্পনিক চিত্র উপস্থাপন করেছিলেন, যেটি প্রকৃতই মহান। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মহান আদর্শে পরিপূর্ণ এই কবিতাটি দীর্ঘ ৭৪ বছর পরেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দলের লোকদের যে ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে তা বলাইবাহুল্য। আর তাই হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিল যে, পরাধীন ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে যদি এই কবিতা সাড়া জাগাতে পারে তাহলে এই জরুরি অবস্থাতেও সম্ভব। মূলত, এই কবিতা পড়ে ভারতবাসী তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য একত্রিত হতে পারে- এই আশঙ্কাতেই তাঁরা এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। আসলে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ইন্দিরা গান্ধি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, কোনো রকম বিরোধিতার গন্ধ পেলেই তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তাঁর সেই তালিকা থেকে বাদ যাননি। এই ঘটনার পর তৎকালীন প্রশাসকবৃন্দ বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই ভারত সরকারের মুখ্য

তথ্য অফিসারের নির্দেশে সরকারের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে লেখা ঔপন্যাসিক চারণ্য সেনের ‘ব্রুটাস তুমিও !!’ (১৯৮১) উপন্যাসেও ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’ কবিতাটির নিষিদ্ধ হওয়ার উল্লেখ যেমন আছে তেমনি ফ্রমে বাঁধানো এই কবিতাটিকে সম্মূলে ধ্বংস করার কথাও বলা হয়েছে।

শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের বহু গানও সেন্সরের আওতায় পড়েছিল। আমরা দেখেছিলাম যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনে রবীন্দ্রনাথের গান রেডিও মাধ্যমে প্রচারের ব্যাপারে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও ভারতীয় বলে নয়, রবীন্দ্রনাথের গানের কথার জন্য, সে কথা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম দেশে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর থেকে। বাণী ঠাকুরকে একবার একটা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান গাইতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গানটিই জোর করে গেয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সেই সময় শাসক দলের রোষ কতটা তীব্র ছিল। এমনকি সেই সময় রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ডিং- এও সেন্সর প্রথা চালু হয়েছিল এবং আকাশবাণী রবীন্দ্রনাথের কোন গান প্রচার করবে তারও সিদ্ধান্ত নিতেন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ।৮

জরুরি অবস্থায় অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় বহু রবীন্দ্রসংগীত মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তথ্যসূত্রে বেশ কিছু গানের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে-

১। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে

২। আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে,

৩। আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে, ৪। আমি ভয় করব না না ভয় করব না

৫। আমরা নতুন যৌবনেরই দূত

৬। উলিঙ্গিনী নাচে রণ রঙ্গে

৭। এ কী অন্ধকার, এ ভারতভূমি

৮। এবার আমার অসীম পাথার

৯। এখনও আঁধার রয়েছে হে নাথ

১০। তোদের বাঁধন যত শক্ত হবে

১১। কোন ভীৰুকে ভয় দেখাবি

১২। দুঃখের তিমির যদি জুলে

১৩। দুঃখের বেশে এসেছ বলে

১৪। দেশ দেশ নন্দিত করি

১৫। বেদনার মতো

১৬। বাঁধন ছেড়ার সাধন হবে

১৭। বাধা দিলে বাধবে লড়াই

১৮। বেদনা কি ভাষায় বে

১৯। ভয় করবো না

২০। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

২১। শোনো শোনো আমাদের ব্যথা

২২। সকাতরে ঐ কাঁদেছে সকলে

২৩। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী

২৪। এ পরবাসে রবে

২৫। আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন সেকি এমনি রবে।

এছাড়াও আরও অনেক রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলের ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার’ গানটিও নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান পেয়েছিল।^{১৯}

সূত্রাং দেখা গেল, ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থায় শিল্প-সংস্কৃতির গায়ে বিভিন্ন দিক থেকে নিষিদ্ধের তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এককথায় রাজশক্তির কোপ পড়েছিল এগুলির ওপর। অর্থাৎ গোষ্ঠী আক্রমণ করেছিল ব্যক্তিকে। কারণ রাষ্ট্র একটি Institution। তার কিছু নিয়ম নীতি আছে। সে চায় তার অধীনস্থ সকলে সেই নিয়ম নীতিগুলোকে মেনে চলুক। তা না হলে রাষ্ট্র নামক Institution টা ভাঙতে শুরু করবে। তখন বিপদটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তির। রাষ্ট্রশক্তি কোনোভাবেই সেই মতটাকে বেড়ে উঠতে দেবে না। সে মত প্রগতিশীল হলেও। তাই রাষ্ট্রের আক্রমণ নেমে আসে ব্যক্তির ওপর। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁর লেখা কবিতা ও গানগুলির ওপরও সেন্সরের কোপ নেমে এসেছিল। আর এই দৃশ্য দেখে মনে প্রশ্ন জাগে যে, আমরা কি এই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? কিংবা আমরা কি আদৌ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলাম? উত্তর অবশ্যই না। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার (১৯৪৭) ২৮ বছর পরেও (১৯৭৫) ভারতবাসীর অবস্থা সেই একই জায়গাই ছিল। শুধুমাত্র ক্ষমতার হাত বদল হয়েছিল মাত্র। কিন্তু দেশবাসীর ওপর শোষণের মাত্রা একই ছিল। বলাবাহুল্য স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা যে যথেষ্ট লজ্জা ও অপমানকর ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাইহোক, কালের নিয়মে এই ইতিহাস হয়তো মুছে গিয়েছে, উঠে গিয়েছে জরুরি অবস্থা, ফিরে এসেছে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন, মানুষ আবার ফিরে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান, সংবাদপত্র, নাটক ও চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য শিল্প- সংস্কৃতিকে। কিন্তু সেই পুরোনো ইতিহাসকে যেন আমরা ভুলে না যায়। কারণ, ইতিহাস হল সংস্কৃতি ও জীবনের অঙ্গ। আর সেই জীবনের সঙ্গে জুড়ে আছে সবকিছু। তবে সংস্কৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একথা জোর গলায় আজও বলা যায় না। কারণ, আজও নানান রঙের শাসকের নানা ধরনের আগ্রাসন, নানা রূপের ‘সেন্সরশিপ’ আমাদের চারপাশে চোখে পড়ে। আর এটাই আমাদের ‘ট্র্যাডিশন’। তবু শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমেই গড়ে উঠুক শিল্পী তথা কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী মানসিকতা এটাই সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ হিসাবে আমাদের একমাত্র কাম্য।

মহর্ষি সরকার

গবেষক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যসূত্র

১। রবীন মণ্ডল, ‘ত্রস্ত আইন প্রণয়ন’, জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত ‘কলিকাতা’ পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা-১৯৭৫), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৬৯।

২। জ্যোতি বসু, ‘যতদূর মনে পড়ে’, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা. ৩২৯-৩৩০।

৩। রামকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, ‘কয়েকটি তথ্য’, জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত ‘কলিকাতা’ পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা (বর্ষা-১৯৭৫), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৯।

৪। সন্দীপ দত্ত, ‘ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস’, তাপস চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ’ (সংযোজিত ও পুনর্মুদ্রিত), গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর), কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ৩৫ (পরিশিষ্ট-৯)।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৫-৩৬ (পরিশিষ্ট-৯)।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৬ (পরিশিষ্ট-৯)।

৭। নিরঞ্জন হালদার, ‘জরুরি অবস্থায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা’, জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত ‘কলিকাতা’ পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যা (বসন্ত-১৯৭৭), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলিকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ১৩।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪।

৯। সন্দীপ দত্ত, ‘ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস’, তাপস চক্রবর্তী সম্পাদিত ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ (সংযোজিত ও পুনর্মুদ্রিত), গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর), কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ৩৬ (পরিশিষ্ট-৯)।

'[https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=ভারতে_জরুরি_অবস্থা_\(১৯৭৫-১৯৭৭\)&oldid=3835784](https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=ভারতে_জরুরি_অবস্থা_(১৯৭৫-১৯৭৭)&oldid=3835784)' থেকে আনীত

এ পৃষ্ঠায় শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১৬:৫৫টার সময়, ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে।

লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন। উইকিপিডিয়া®, অলাভজনক সংস্থা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।